মাটির মানুষ

সৌরভ সেন এই প্রথম কলম ধরলেন উদ্ভাসের জন্য। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন এমন একজন শিল্পীর সঙ্গে যিনি নিজেকেই আবিষ্কার করলেন হঠাৎ। এবার আমাদের আবিষ্কারের পালা।

আমার মনে হয় একটি শিল্প, তা সে ছবি হোক, ভাস্কর্য হোক কিংবা স্থাপত্য, তার পরিপূর্ণ রূপটার চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় তার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার পদ্ধতিটা। সে যেন এক জাদুবাস্তব। শিল্পী কিভাবে মগ্ন হয়ে সেই পরিপূর্ণতা গড়ে তোলে সেটা একটা ভাবার মতো বিষয়। এ যেন অনেকটা মানুষের জীবনের মতো। আমরা যে মানুষটিকে জানি, চিনি, সাফল্য-ব্যর্থতা দিয়ে যাকে বিচার করি, তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল, সাফল্য ও ব্যর্থতাময় জীবনটা গড়ে ওঠার কাহিনি। সে এক আশ্চর্য রসায়ন।

কর্মসূত্রে আমি গৌতম মুখোপাধ্যায়কে চিনি বেশ কিছুদিন ধরে। অফিসের কাজের চৌহদ্দির বাইরে গৌতমদার তৈরি বিভিন্ন ভাস্কর্য ও ছবি আমাকে তাঁর প্রতি বাড়তি কৌতূহলী করে তুলেছিল। বিশেষ করে মাটি দিয়ে তৈরি তার ভাস্কর্যগুলি আমাকে মুগ্ধ করেছিল প্রথমেই। সচরাচর আমরা মাটি দিয়ে হাতে গড়া বা ছাঁচে তৈরি মূর্তি দেখি, কিন্তু মাটির মণ্ডের ওপর ভাস্কর্য খুব একটা দেখি না। এই জায়গা থেকেই প্রাথমিকভাবে গৌতমদার কাজের প্রতি আমি আগ্রহী হয়ে উঠি। ড. গৌতম মুখোপাধ্যায় পেশায় স্থপতি, পরিকল্পনাবিদ ও পরিবেশবিদ। ১৯৭৯-এ তিনি শিবপুর বি. ই. কলেজ থেকে স্থপতি ডিগ্রি পান। স্থপতি হওয়ার কারণে ছবি আঁকার অভ্যেসটা তাঁর ছিলই। পরবর্তীতে হঠাৎ করে তিনি আকৃষ্ট হলেন ভাস্কর্যের দিকে। সেই সময়ের কথা তিনি নিজেই বলেছেন ভারি চমৎকারভাবে। ‘তখন ১৯৮৪-৮৫ সাল হবে। তখন ঘন ঘন ও দীর্ঘক্ষণ লোডশেডিং হত। আমি পড়াশোনা করতাম, কাজ করতাম। কিন্তু লোডশেডিং হলেই অখণ্ড অবসর। বিশেষ কিছু পড়াশোনাও করা যেত না। অন্যমনস্কভাবে *দেশ* পত্রিকার পাতা ওল্টাতাম। বইপত্তর, শিল্পকলার প্রসঙ্গে ছোটো ছোটো রিভিউ প্রকাশ হত। একদিন হঠাৎ একটি ছবিতে চোখ আটকে গেল। বোধহয় রামকিঙ্কর বেইজের তৈরি কোনো মূর্তি ছিল সেটা। একটি মাতৃমূর্তি হাতে তার শিশুসন্তান। মনে মনে ভাবলাম – আমি কি এইরকম একটা মূর্তি গড়তে পারি না! কোনোদিন মূর্তি গড়িনি বলে কি একটিবার

চেষ্টাও করতে নেই। তারপর খোঁজ করলাম তেমন কার্যকরী এঁটেল মাটি কোথায় পাই। খোঁজও পেলাম। বালিতে এক কুমোর পাড়া থেকে পাঁচ টাকার মাটি কিনে নিয়ে এলাম। শুরু হল মূর্তি গড়া। প্রথমে সেই মাটিকে মণ্ড করে শুকিয়ে নিয়ে তারপর সেই মাটির দলা থেকে কেটে কেটে বের করে আনতে লাগলাম সেই স্নেহশীলা মাতৃমূর্তি। মূর্তিটায় একটা সুবিধে ছিল, তাতে চোখমুখের কাজ ততখানি সূক্ষ্ম করে দেখাবার দরকার ছিল না।'

এইভাবে শুরু হল গৌতমদার ভাস্কর্যচর্চা। প্রথম মূর্তিটি গড়ার পর বেঁচে যাওয়া মাটি দিয়ে তৈরি হল আরেকটি কাজ। সেটি ছিল বিদেশি ম্যাগাজিন স্প্যান-এ প্রকাশিত একটি পেশিবহুল সুঠাম চেহারার এক পুরুষের ছবির প্রেরণায় করা। তখন মূর্তি বানানোর সরঞ্জাম বলতে তেমন কিছু ছিল না গৌতমদার। ছুরি, স্ক্রু-ডাইভার, পেনসিল, নষ্ট হয়ে যাওয়া তুলির পেছন দিকের সহায়তায় ভাস্কর্য সৃষ্টি করতেন। গৌতমদার এই ভাস্কর্যচর্চা এতটাই আকস্মিক ছিল যে তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত চমকে গিয়েছিলেন। এত দক্ষতা কারো কাছে না শিখেই! অবাক তো হবেনই। স্ত্রীর প্রশংসায় শিল্পী নিজেও কিছুটা লজ্জিত। তারপর ধীরে ধীরে একটা দুটো করে কাজ জমে উঠতে থাকে। আত্মীয়-বন্ধুরা ভাবতেন এসব বুঝি নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে আনা। স্বয়ং গৌতমদারই কাজ একথা জেনে তাঁদের স্তম্ভিত হবার পালা।

গৌতমদা মূর্তি গড়ে চলেন একের পর এক। তারপর একটা সময়ে মাটি সংগ্রহ করা সমস্যা হয়ে দেখা দিল। তাঁরা থাকেন সল্টলেকে। সেখান থেকে হাওড়ার বালিতে গিয়ে নিয়মিত মাটি নিয়ে আসা সহজ কথা নয়। এই সমস্যার সমাধানের কথা গৌতমদা নিজের মুখেই বললেন – 'সল্টলেকে তখন বড়ো বড়ো ট্রেঞ্চ খুঁড়ে বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেই ট্রেঞ্চ থেকে তোলা মাটির গভীর অংশে হাত দিয়ে দেখি, বাঃ বেশ তো আঠালো ও পেছলভাব। সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করে জানলাম তার মধ্যে এঁটেলমাটির সবগুণই থাকা সম্ভব। মাটির সমস্যা দূর হল, বুঝলাম শুধু কাঁকর, ময়লা এগুলো পরিস্কার করতে পারলেই আমার কাজ হবে দিব্যি। তোমাদের বৌদি একটি বড়ো গামলা দিল। তাতেই মাটি জমানো হলো, ভাঙা হল, ঢেলে পরিষ্কারও করা হল। তারপর তাতে জল দিয়ে সারারাত

ভিজিয়ে রাখাতে পরদিন ফুলে উঠল সেই মাটি। ভালো করে সেই মাটি মেখে তুলে রাখা হল অন্যপাত্রে।' এই মাটি সংগ্রহ করতে গিয়ে গৌতমদা বিপদেও পড়েছিলেন। জমিতে কাটা ট্রেঞ্চের পাশে পড়ে থাকা মাটি নিতে গিয়ে পাহারাদারের তাড়া খেয়েছেন, অপমানিতও হয়েছেন। তবু হাল ছাড়েননি। সমস্যার সমাধান হয়েছে অন্যভাবে। বাড়ির কাজের মেয়েটির সৌজন্যে ঘরে মাটি এসেছে সসম্মানে। মূর্তি তৈরির পাশাপাশি প্লাইবোর্ডের ওপর মাটি দিয়ে রিলিফ-ভাস্কর্যের মতো করে কাজও করেছেন বেশ কিছু। সে যেন অনেকটা মাটি দিয়ে ছবি আঁকার মতো ব্যাপার।

জন্মসূত্রে গৌতমদা বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মানুষ। জন্ম ১৯৫৮-তে। তাঁর নিজের বাড়ি কৃষ্ণনগরে। তাঁর মামার বাড়ি ও পৈতৃক ভিটে দু-জায়গাই মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত। মনে হয় এইকারণেই গৌতমদা এমন মাটির মানুষ হয়ে উঠেছেন। পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র গৌতমদার পছন্দের বিষয়। বিভিন্ন গাছ সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ অপরিসীম। সেইসঙ্গে প্রাণীদের প্রতি, বিশেষতঃ পাখিদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও জ্ঞানও অবাক করার মতো। তাঁর বাড়িতে বিভিন্ন পাখিরা মাঝেমাঝেই যাতায়াত করে ও আতিথেয়তা নেয়। কাঠবেড়ালি এসে গৌতমদার সঙ্গে প্রাতঃরাশ সেরে যায়। ভ্রমণে ও ফোটোগ্রাফিতেও তাঁর নেশা। নিজের কর্মজগতে গৌতমদা কৃতী ও সুপরিচিত হলেও তাঁর শিল্পী-পরিচয়ের কথা কিন্তু খুব বেশিজন জানেন না।

সঙ্গের ছবিগুলি সবই ড. গৌতম মুখোপাধ্যায়ের নিজের তৈরি ভাস্কর্যের ফোটোগ্রাফ।